ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম : ঈশ্বরের স্বরূপ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

[স্বনামধন্য পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর জীবৎকালে তাঁর সঙ্গে নিবোধত-র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এ-পত্রিকায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বহুবার লেখা দিয়েছেন তিনি। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে তাঁর দেওয়া 'Sri Ramakrishna's Religion' নামে ইংরেজি বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। প্রখ্যাত মনীষীর মননঋদ্ধ বক্তৃতাগুলির অনুবাদ প্রকাশে আমরা ব্রতী হয়েছি। এবারের প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন **সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত**।]

আমি দুটি প্রাসঙ্গিক বিষয় বা প্রশ্ন উত্থাপন করব—ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার এবং তিনি ব্যক্তি-ঈশ্বর না নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্যস্বরূপ। এই প্রশ্ন আলোচনা করার আগে আমাদের মনে একটা ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার—তা হল, নিরাকার ঈশ্বরও কিন্তু ব্যক্তি-ঈশ্বর রূপে পরিগণিত হতে পারেন। ব্রাহ্মধর্মমতে ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু তিনি ব্যক্তি। মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাও নিরাকার ব্যক্তি-ঈশ্বরের উপাসনা করেন। হিন্দু ধর্মভাবনায় ঈশ্বর ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক, সাকার ও নিরাকার উভয়ভাবেই উপাস্য। হিন্দু আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাতেও দেখি দেবতারা ব্যক্তি-ঈশ্বররূপেই উপস্থাপিত। ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত দেবদেবীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলি নানা স্তোত্রে বর্ণিত। তাঁরা প্রার্থনা শোনেন এবং সেই প্রার্থনা পূরণ করতেও সক্ষম। ঋগ্‌বেদের যুগে কোনও দেবায়তন বা দেবমূর্তির অস্তিত্ব ছিল না। তবে এযুগের দেবদেবীদের মূর্তির বর্ণনা মন্ত্রে পাওয়া যায়। সুতরাং ঋগ্‌বৈদিক যুগে ঈশ্বর ব্যক্তিকেন্দ্রিক না নৈর্ব্যক্তিক, সাকার না নিরাকার—এ-প্রশ্ন ওঠে না।

বৈদিক যুগের শেষে উপনিষদের যুগে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ধারণার উদ্ভব হল; এবং তখনই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠল। এই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর 'ব্রহ্ম' আখ্যায় পরিচিত হলেন। উপনিষদে তিনি মানববোধের অতীত। এই ধারণা থেকেই নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা উদ্ভূত। এই পরমেশ্বর সম্বন্ধে কেনোপনিষদ বলেন, ''নয়ন সেখানে গমন করে না, বাক্য গমন করে না, মনও গমন করে না (১।৩)।'' এই পরমশক্তিমান চৈতন্যকে কোনও বিশেষ ব্যক্তিরূপে আমরা গণ্য করতে পারি না। অদ্বৈতবাদী উপনিষদ গ্রন্থসমূহে ব্যক্তি-ঈশ্বরের কোনও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ অদ্বৈতবাদে ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণার কোনও স্থান নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ছান্দোগ্যের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি'—কোনও ব্যক্তি-ঈশ্বর ভাবনার আভাস দেয় না। এমনকী অদ্বৈতদর্শনে প্রার্থনারও

স্থান নেই। কিন্তু কোনও কোনও উপনিষদে ঈশ্বর এক ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত যাঁকে দর্শনও করা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাকার ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে ঋষি বলেছেন : সপ্রকাশ ও অজ্ঞানাতীত এই সর্বব্যাপী পুরুষকে আমি জানি। তাঁকে জানলেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে; কারণ পরমার্থলাভের আর কোনও উপায় নেই (৩।৮)। দেখা যাচ্ছে এই উপনিষদটি দ্বৈতবাদী দর্শন-ভিত্তিক। সমগ্র ঔপনিষদিক সাহিত্যকে যদি 'বেদান্ত' বলে চিহ্নিত করা যায় তবে বলতে হয় যে বেদান্ত ব্যক্তি-ঈশ্বর ও নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর উভয়কেই স্বীকার করে এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বেদান্ত যুগপৎ অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদকে সমর্থন করে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, বেদান্তের সার বলে পরিগণিত 'বাদরায়ণসূত্র' বা 'বেদান্তসূত্র' বা ব্রহ্মসূত্র কোন মতবাদের প্রবক্তা? আমি মনে করি, এটি দ্বৈতবাদ প্রচার করে। রাধাকৃষ্ণণ ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে অদ্বৈতবাদী শংকর সংখ্যালঘু, অবশ্য এই সংখ্যালঘুত্বের গৌরব অনস্বীকার্য।

ঋগ্‌বেদের যুগের মতো উপনিষদের যুগেও দেবালয়ে প্রতিমা উপাসনার উল্লেখ না থাকলেও 'সূর্যপ্রতিম পরমপুরুষের' বাচিক মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যেকোনও আলোচনায় কোনও না কোনওভাবে দেবতার বর্ণনা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। ব্রাহ্মধর্মে দেবতাকে কোনও প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয় না, কিন্তু ভক্তিমূলক ব্রহ্মসংগীতে বাচিক মূর্তি আভাসিত। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে' গানের ভাষা অনুধ্যান করলে উপলব্ধি হয় যে, পৌত্তলিকতা নিষিদ্ধ হলেও এই ধর্মে ঈশ্বরের আকার আভাসিত, তিনি একজন ব্যক্তি।

শংকরাচার্যের মতে ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক, নির্গুণ, নিরাকার। তথাপি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সীমা যাঁরা অতিক্রম করতে অক্ষম, তাঁদের জন্য শংকর 'ঈশ্বর' আখ্যায়িত এক ব্যক্তি-দেবতার ধারণা উপস্থাপিত করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেছেন এবং দেবদেবীদের উদ্দেশে স্তব রচনা করেছেন।

এইভাবে ঋগ্‌বেদ থেকে ঔপনিষদিক যুগ হয়ে শংকরের যুগ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক ইতিহাসের ধারা পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাই নিরাকার ও সাকার, ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকরূপে ঈশ্বর উপস্থাপিত।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে লৌকিক ভাষায় রচিত ভক্তিগীতিতে বেদান্তের প্রভাবে ব্যক্তি-ঈশ্বর ও নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর, এবং সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা জন্মায়। এই প্রসঙ্গে কবীরের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। কবীর পৌত্তলিকতার নিন্দা ও শাস্ত্রীয় আচারবিধিকে বিদ্রূপ করেছেন। উত্তর ভারতে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাসীরূপেই কবীর সমাদৃত। ড. পীতাম্বর দত্ত ১৯৩৬ সালে বার্থওয়েলের 'Nirguna School of Hindu Poetry' প্রকাশ করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক মন্তব্য করেছেন : '' 'নির্গুণবাদ' বিশেষণটিকে খুব যথাযথ বলে গণ্য করা যায় না। সন্তদের একদেশদর্শিতার কথা বাদ দিলেও আরও যা লক্ষণীয় তা হল, এঁরা একদিকে ঈশ্বরের সগুণভাবটিকে অস্বীকার করেছেন, আবার নির্গুণভাবকেও চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে পারেননি।" এখানেই মরমি কাব্যের রহস্য বা স্ববিরোধিতা নিহিত। ঈশ্বর প্রসঙ্গে যেকোনও আলোচনায় সরব হলেই কোনও না কোনওভাবে দ্বৈতবাদী মনোভাব এবং সাকার ঈশ্বরের আভাস অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। একটি বিমূর্ত ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই কারণে ঈশ্বরের বর্ণনায় তাঁর উদ্দেশে বহু বিশেষণ আরোপিত হয়ে থাকে। বস্তুত 'নির্গুণত্ব' শব্দটিকে বিশেষণ আখ্যা

দেওয়া যুক্তিযুক্ত। অতীন্দ্রিয়বাদী যখন বলেন তাঁর ঈশ্বর অনির্বচনীয়, তখন তিনি ঈশ্বরে 'অনির্বচনীয়ত্ব' গুণটি আরোপ করেন। আমাদের প্রতিটি বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় অংশ থাকেই। কোনও বস্তু সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে তার ওপর গুণ আরোপিত হয়েই পড়ে। আর বাক্যাতীত অবস্থায় সবই নীরব। Wittengenstein-এর ভাষায় : ''যখন বাক্যস্ফূর্তি হয় না তখন নীরবতা ছাড়া উপায় নেই।'' ড. এফ ই কিই তাঁর 'Kabir and His Followers' (১৯৩১) গ্রন্থে কবীরের ঈশ্বর-ভাবনা সম্বন্ধে এক অতি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন : ''বেদান্তের পরব্রহ্ম একটি বিমূর্ত তত্ত্ব, কারণ তিনি নির্গুণ। কিন্তু মানুষ নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে না। দেখা গেছে যেখানেই অদ্বৈতবাদ, সেখানে ঈশ্বরকে সগুণ বলে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।... কবীরের কাছেও তাঁর ঈশ্বর বিমূর্ত তত্ত্ব মাত্র ছিল না।''

'Mysticism' (১৯১১) নামক বৃহদায়তন সাহিত্যকর্মের জন্য বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী লেখিকা Evelyn Underhill রবীন্দ্রনাথের 'One Hundred Poems of Kabir' (১৯১৫) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, কবীর সেইসব মরমিয়া সাধকদের অন্যতম, যাঁরা ব্যক্তি-ঈশ্বর ও নৈর্ব্যক্তিক, ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গত, নিষ্ক্রিয় ও ক্রিয়াবান, অখণ্ড ব্রহ্ম ও ভক্তসখা—এইসব চিরন্তন বিবদমান আপাতবিরোধী তত্ত্বের চির-সমন্বয় সাধন করেছেন।

ভক্তকবির কল্পনাতরঙ্গ তাঁকে ক্রমাগত ব্যক্তি-নৈর্ব্যক্তিক, ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর, অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক ভাবের মধ্যে ভ্রমণ করায়। ইতিপূর্বেই আমি উদ্ধৃত করেছি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের ভক্তিগীতি : (মা) ''কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি কখনও শূন্যরূপা রে।''

এই শূন্যতাকে রবীন্দ্রনাথ পরমেশ্বরের আবরণ বলে মনে করেন। এখানে সপ্তদশ শতকের ইংরেজ কবি Thomas Traherne কে উদ্ধৃত করে বলি :

''এ কী আনন্দ, কী বিস্ময় আর কী উল্লাস!
হে পবিত্র প্রহেলিকা!
মম আত্মা এক অনন্ত সত্তা;
ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি
এক শুদ্ধ অস্তিত্বময় আলোক—
আপাতশূন্যময়তা পরমচৈতন্যের অবভাস।''

কবির দৃষ্টিতে তাঁর আত্মা দেবতারই প্রতিচ্ছায়া। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে এক ধরনের খ্রিস্টীয় অদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করা যায়। পরক্ষণেই কবি বলে ওঠেন যে পরমচৈতন্য শূন্যময়রূপেই প্রতিভাত। এখানে এই শূন্যময়তা ঈশ্বরের অপরিহার্য সারাংশ বলেই ভাবা হচ্ছে। এই শূন্যতার অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কবির ঈশ্বর উঁকি মারেন। এই মানসিকতায় পরমেশ্বরকে মনে হয় চরম শূন্যতার প্রতিফলন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও যুক্তিতর্কের অবতারণা করে ব্যক্তি-ঈশ্বর ও নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর, সাকার অথবা নিরাকারের দ্বন্দ্বের সমাধান করেননি। বরং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে এর সমাধান করেছেন। কথামৃতের সূচনায় ১৮৮২ সালে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর যে-কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে, সেখানে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করছেন : ''আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে'?'' উত্তরে মহেন্দ্রনাথ বলেন, ''আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটি ভাল লাগে।'' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ''তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল।... তবে এ-বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য।''

সিঁথিতে বেণীমাধব পালের বাগানবাড়িতে অনুষ্ঠিত একটি ব্রাহ্মউৎসবে ১৮৮২ সালের ২৮ অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ যোগ দেন। সেখানে এক ব্রাহ্মভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করেন : ''ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?'' এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : ''তাঁর

ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস। তাই ভক্তের ঈশ্বর 'ব্যক্তি' (Personal God) হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার করে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।"

আরও সুস্পষ্ট করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : ''সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত জলরাশি। মহাসাগরের জল, ঠাণ্ডা দেশে স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তি হিমে সেই সচ্চিদানন্দ (সগুণ ব্রহ্ম) ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন।...জ্ঞানসূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, নির্বিকল্পসমাধির পর, আবার সেই অনন্ত, বাক্যমনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম!"

দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮৩ সালের ১ জানুয়ারি কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : ''সাকাররূপ কিরকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি ওঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক-একটি রূপ উঠছে দেখা যায়। অবতারও একটি রূপ। অবতারলীলা সে আদ্যাশক্তিরই খেলা।" ১৮৮৩ সালের ১১ মার্চ তিনি বলেছিলেন : ''যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। আরও তিনি কত কি আছেন তা বলা যায় না।" এই প্রসঙ্গের প্রাঞ্জলতর ব্যাখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন ২২ এপ্রিল ১৮৮৩ বেণীমাধব পালের বাগানবাড়িতে। ''সাকার-নিরাকার দুই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জানো? যেমন রোশনচৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে—তার বাঁশির সাত ফোকর সত্ত্বেও। কিন্তু আর-একজন দেখ কত রাগ-রাগিণী বাজায়! সেরূপ সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কতভাবে সম্ভোগ করে! শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—নানাভাবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ নানা বিচিত্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষপাতী ছিলেন। উপনিষদের মন্ত্র 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' বা 'তত্ত্বমসি'র মাধ্যমে ব্যক্ত আধ্যাত্মিক ভাবনাকে তিনি উচ্চস্থান দিতেন। এ-প্রসঙ্গে ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮৩ তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : ''সে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে। চিন্ময় শ্যাম। চিন্ময় ধাম। ভক্তও চিন্ময়। সব চিন্ময়। এ-ভক্তি কম লোকের হয়।" ১৮৮৫ সালের ১৪ জুলাই, তাঁর মহাসমাধির প্রায় এক বৎসর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের বলেন, ''ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার-সাকার দুইই লয়,—অরূপ-রূপ দুইই গ্রহণ করে।" এই সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর সর্বশেষ মন্তব্য ২২ অক্টোবর* ১৮৮৫ সালে করেছিলেন। 'ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার' বলে তিনি ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন, ''একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথদর্শন করতে গিছিল। জগন্নাথদর্শন করে সন্দেহ হল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল, জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কিনা। একবার এ-ধার থেকে ও-ধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই! আবার দণ্ড এ-ধার থেকে ও-ধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল; তখন সন্ন্যাসী বুঝলে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।"

আমরা দেখলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার, ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক বলে মানতেন।

---

* তারিখটি মূল বক্তৃতায় রয়েছে ১৮ অক্টোবর। কিন্তু উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত অখণ্ড কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই গল্পটি ২২ অক্টোবর তারিখে কথিত হওয়ায় আমরা সেই তারিখই অনুসরণ করলাম।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী ছিল। উত্তরটি অতি সহজ। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ব্যক্তি-ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম এবং নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর নির্গুণ ব্রহ্ম। ১৮৮৩ সালের ২২ এপ্রিল জনৈক ব্রাহ্ম ভক্তের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন, ''যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিন গুণের অতীত তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, বাক্য-মনের অতীত বলা যায়; পরব্রহ্ম।''

এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রশ্ন ওঠে যে যদি সক্রিয় পরব্রহ্ম বা আদ্যাশক্তি সগুণ ব্রহ্মরূপে গণ্য হন, তবে কালী, যাঁকে আমরা আদ্যাশক্তি বলি, তিনি কী করে পরব্রহ্মরূপে পরিগণিত হতে পারেন। ২৭ অক্টোবর ১৮৮২ নৌকাভ্রমণকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ''ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।'' এখানে তিনি সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেননি। বস্তুত তিনি আপাতবিরোধী এই দুটি ভাবনার সমন্বয় করে অখণ্ড পরম সত্যকে তুলে ধরেছেন। ওইসময় তিনি আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, ''ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না! আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী!''

শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে অসচেতনভাবেই শংকর কথিত ব্রহ্ম এবং ইন্দ্রিয়গোচর জগতের 'ঈশ্বরে'র মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দুইটি 'ব্রহ্ম' সত্তার কথা বলেননি। তিনি ব্রহ্মের দুটি দিকের কথা বলেছেন। শংকরের ধারণায় ঈশ্বর ও ব্রহ্ম দুটি পৃথক তত্ত্ব। ঈশ্বর অনিত্য প্রত্যক্ষগোচর জীবজগতে উপস্থাপিত। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু উচ্চকোটির ব্রহ্ম ও তদপেক্ষা নিম্নকোটির ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা করেননি। শংকর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কারণ শ্রুতিতে তাঁর উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যনির্ভর তত্ত্ব বলেই ঈশ্বর শংকর দ্বারা স্বীকৃত। অবিদ্যার অনিত্য জগতে মায়ার ফাঁদে আবদ্ধ জীবের কথা বিবেচনা করে শংকর এই ঈশ্বরতত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক জগতের দুই স্তরের মানুষের জন্য দুই পৃথক ঈশ্বরের উপস্থাপনা করেননি। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ একজন প্রকৃত অদ্বৈতবাদী কারণ তাঁর মতে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর সর্বজনীন। শ্রীরামকৃষ্ণ যথার্থ অর্থে আধুনিক যুগের নববেদান্তবাদের প্রবর্তক, কারণ তিনি সর্বজনের উপাস্য এক ব্রহ্মের ধারণা উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর আলাপচারিতায় হয়তো সর্বদা যুক্তির সংগতি রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু ভাবের সুসংগতি সর্বদা পরিলক্ষিত হত। তিনি কখনই স্ববিরোধী চিন্তাকে প্রাধান্য দেননি। Heinrich Zimmer তাঁর গ্রন্থ 'Philosophies of India'-তে বলেছেন, তাঁর ধারণা কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ-উপস্থাপিত ব্রহ্মতত্ত্বের মূলে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসে তন্ত্রের প্রভাব। যদিও মানতে হবে যে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মতত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়, তবুও আমি একেবারে স্বীকার করি না যে তিনি কোনওভাবে তন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনহাজার বছরের প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যবাহী যে-সংস্কার ভারতবাসীর বোধ ও বুদ্ধির প্রবাহে প্রবেশ করেছে, সেই ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট তাঁর আপনসত্তা থেকেই প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর ভাবনা।

আমার সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, না দ্বৈতবাদী, তা নিরূপণ করা। কথামৃতে দেখি তিনি কখনও দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ সম্পর্কিত কোনও দ্বন্দ্বের অবতারণা করেননি। এই প্রসঙ্গে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত কিছু মন্তব্যের প্রতি। তিনি অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী যাই হোন, তাঁর এই কথাগুলি আমাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবে। ১৮৮৫

সালের ১১ মার্চ তিনি বলেন, ''শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।'' বেদান্তের ইতিহাসে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—উভয় মতই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে সপ্তম শতকের তামিল আলওয়ার থেকে বিংশ শতকের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিদের মাতৃভাষায় রচিত আধ্যাত্মিক কাব্যসমূহ দ্বৈতবাদী অনুভূতির শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ; অপরপক্ষে অদ্বৈতবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দার্শনিক তর্কবিচারের স্তরে আবদ্ধ। এর প্রধান কারণ অদ্বৈত অনুভূতি অনির্বচনীয়। ধর্মীয় কাব্যসমগ্র অবশ্যম্ভাবিরূপে ভক্তিরসাশ্রিত।

ব্রহ্মসূত্রকে অদ্বৈতবাদী গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করা একটি ভ্রম। উপনিষদের পরে সর্বপ্রথম রচিত এই বেদান্তশাস্ত্রটির রচনাকাল নির্ধারণ করা খুব সহজসাধ্য নয়। Jacobi-র মতে এটি খ্রিস্টীয় ২০০ ও ৪৫০ অব্দের মধ্যে রচিত। কিন্তু এস এন দাশগুপ্ত এটির রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ বলে মনে করেন। রাধাকৃষ্ণণের মতে এটির রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ। অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে লিখিত অতি দুরূহ এই গ্রন্থটি পাঠ করে আমার মনে হয়েছে এটি দ্বৈতবাদকেই সমর্থন করেছে। রাধাকৃষ্ণণ তাঁর 'Indian Philosophy' (১৯২৩) শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, ''সম্ভবত বাদরায়ণ বিশ্বাস করতেন যে ঐশী শক্তির অন্তর্নিহিত একটি পরিবর্তনশীল দিক বা স্বগতভেদের সাহায্যে ব্রহ্ম নিজেকে নানা বস্তুর মধ্যে প্রকাশ করতে এবং ব্যক্তিজীবনের সীমাবদ্ধতায় নিজেকে আবদ্ধ করতে সক্ষম।'' রাধাকৃষ্ণণ নিজের প্রকাশিত 'ব্রহ্মসূত্রে'র (১৯৬০) ভূমিকাতে লিখেছেন, ''বাদরায়ণকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাসী না বলে বরং আস্তিক আখ্যা দেওয়া অধিকতর সংগত বলে মনে হয়।'' সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'A History of Indian Philosophy' (১৯৩২) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, ''শুধুমাত্র সূত্রগুলির ভিত্তিতে বিচার করলে মনে হয় না যে ব্রহ্মসূত্র শংকরের দর্শন সমর্থন করে। কিছু কিছু সূত্রকে শংকর নিজেই দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন।'' আধুনিক যুগে George C. Adams Jr. নামে এক আমেরিকান লেখক ব্রহ্মসূত্রের ওপর গবেষণামূলক কাজ করেছেন, তিনিও আমার সঙ্গে সহমত যে এটিকে কোনওমতেই অদ্বৈতবাদী গ্রন্থ বলে গণ্য করা যায় না। তিনি লিখেছেন, ''বাদরায়ণ পৃথক-অস্তিত্ববাদ ভিত্তিক একটি ধর্মমত উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন ব্রহ্ম ও জীবজগৎ উভয়ই সত্য, এবং এরা দুই পৃথক সত্তা; কিন্তু এ-দুটি এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত যে জগৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে না।''

একই সত্য শ্রীরামকৃষ্ণের আর্ষদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল। যুক্তিবিচারের দ্বারা নয়, নিজস্ব প্রজ্ঞার সাহায্যে তিনি এই উপলব্ধি লাভ করেছিলেন। কথামৃতের একটি উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাব যে রামকৃষ্ণ কীভাবে ব্রহ্ম আর জগতকে পৃথক বস্তু বলে চিন্তা করতেন না : ''একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ আর খোলা আছে। খোলা বীজ ফেলে দিলে শাঁসটুকু পাওয়া যায়, কিন্তু বেলটি কত ওজনে ছিল জানতে গেলে, খোলা বীজ বাদ দিলে চলবে না।... শাঁস যে বস্তুর, বীজ ও খোলা সেই বস্তু থেকেই হয়েছে।''

একেই আমি আখ্যা দেব প্রকৃত অদ্বৈত—সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টির সম্পর্কে এক অখণ্ড, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। *(ক্রমশ)*